Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-I, October 2023, Page No.174-180
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

পাশবিক স্নেহে নারী-পুরুষের বাৎসল্য প্রেমের স্ফুরণ: নির্বাচিত গল্পের প্রেক্ষিতে একটি বিশ্লেষণী পাঠ

প্রসেন নাথ

সহকারি শিক্ষক, ভাটিরকুপা গার্লস এম.ই স্কুল, হাইলাকান্দি,আসাম,ভারত

Abstract:

Since the ancient literature of Bengali, there has been a true spark of brutal love between men and women towards animals. In that case, modern Bengali literature also has no shortage of its superiority. Rabindranath, Vibhutibhushan painted a beautiful picture of the nature lover in their works and Saratchandra and Banphul in their works created the true impression of the animal lover who is an inseparable part of nature in their own works.

The loving relationship between man and the living world, domestic animals and birds, and sincere relationship with children is eternal. So domesticated animals can also become a member of the family. In that formula, the exchange of emotions between the owner and the domesticated animal, honor and respect, animalistic affection and love all come to the fore. The discussion in this article is just an attempt to outline the example of how people tolerate insults, injustices, torture, punishments and sacrifice everything to starve and complete the sense of human responsibility of the brute children.

মানবিকতা আজকাল হারিয়েই যাচ্ছে। কলি যুগের কুপ্রভাবে মানুষ যেখানে মানুষকেই ভালবাসতে চাচ্ছে না,কুদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে,বৃদ্ধ মা-বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে প্রেরিত করে নিজে বিলাসবহুল জীবন যাপন করছে। এতে করে বলা চলে যে মানুষ আসলেই এক বিকলাঙ্গ, স্বার্থান্বেষী,অমায়িক রূপেই দ্রষ্টব্য। এই পরিস্থিতিতে মানুষ যে তার গৃহপালিত পশুকে শিশুসুলভ বাৎসল্য প্রেমের দায়িত্ববোধে স্নেহের উত্তম রূপ দেখাতে পারে তা সত্যিই বিরল। বাংলা সাহিত্যে এমন কিছু গল্প রয়েছে যেখানে নারী এবং পুরুষ উভয়েই তাদের গৃহপালিত পশুদের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসার স্ফুরণ ঘটিয়েছেন। এর উৎকৃষ্টতম উদাহরণ রয়েছে শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' এবং বনফুলের 'গণেশ জননী' গল্পে। 'মহেশ' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র গফুর জোলার আমিনা নামের একটি মেয়ে থাকা সত্ত্বেও পুত্রবৎ মহেশের প্রতি সমস্ত মায়া-মমতা উজাড় করে দিয়েছে। তাছাড়াও 'গণেশ জননী' গল্পে গণেশের জননী অভাবী সংসারেও গণেশের সাজ-সজ্জা,খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে খেয়াল রেখে তাকে প্রতিপালন করেছেন। পাশবিক স্নেহ অর্থাৎ পশুর প্রতি স্নেহের এমন দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে আরও দু-একটি আছে বলে মনে হয় না। উভয় গল্পেই একই সুর ধ্বনিত হয়েছে। এক্ষেত্রে স্বামীজীর সেই মহান বাক্যটির কথাই মনে পড়ে - "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে

ঈশ্বর।" অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত জীব ও প্রাণী ঈশ্বরের সৃষ্টি তাদের ভালবাসলে তবেই জীবন সার্থক হবে এবং ঈশ্বরের সাধনা সম্পূর্ণ হবে।

রবীন্দ্রোত্তর কথাসাহিত্য ধারায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে। তাঁর রচনার শ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে অসামান্য অনুকম্পা ভরা সমবেদনাময় জীবনদৃষ্টি। শরৎচন্দ্র ছোট-বড় অনেক গল্পই লিখেছেন, সমাজ ব্যবস্থা,সামাজিক বৈষম্য, অন্যায়-অত্যাচার, উৎপীড়ন-নিপীড়ন তবে এর পাশাপাশি অপত্য স্নেহের এক বিশ্বজনী চিত্রকেও তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছেন তাঁর 'মহেশ' গল্পে। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গবাসী' নামে একটি মাসিক পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৩৬ সালে গল্পটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সর্বমোট তিনটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত এই গল্পে সমাজ ভাবনা, অপত্য স্নেহ এবং গভীর সহানুভূতি এ তিনটির সমাবেশ প্রাধান্য পেয়েছে।

'মহেশ' গল্পটি শুরুতেই রয়েছে এক নিদারুণ জ্বালাময় পরিস্থিতি -উত্তপ্ত প্রকৃতির জ্বালাময়ী অভিশাপ। শরৎচন্দ্রের ভাষায় -

"সম্মুখের দিগন্তজোড়া মাঠখানা জ্বলিয়া পড়িয়া ফুটিফাঁটা হইয়া আছে, আর সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর ধোঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। অগ্নিশিখার মত তাহাদের সর্পিল ঊর্ধ্বগতির প্রতি চাহিয়া থাকিলে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে- যেন নেশা লাগে।" [১]

স্বৈরাচারী মানসিকতা নিনিয়ে শীর্ষস্থানীয় মানুষেরা সাধারণ মানুষের প্রতি করা অত্যাচারের ফলেই হয়ত প্রাকৃতিক এই প্রাদুর্ভাব এক অসহায় পরিস্থিতির দৃষ্টান্তকেই ইঙ্গিত করছে। এক্ষেত্রে গল্পের প্রথমেই লক্ষ্যনীয় যেখানে কাশীপুর গ্রামের জমিদারের প্রতাপ ও আধিপত্যবাদের এক বিরাট ছবি দ্রষ্টব্য।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিপত্নীক গফুর জোলা দশ বছরের একটি মেয়ে আমিনা নিয়েই তার সংসার। তবে বলা চলে যে ছোট এ সংসারে আট সন ধরে তাদের প্রতিপালন করে বুড়ো হয়ে যাওয়া আরও একজন সদস্য রয়েছে। সদস্যটি হল গফুর জোলার পুষ্য একটি ষাঁড়। নিতান্ত দরিদ্র হওয়া সত্বেও গফুরজোলা এই সারটিকে দিন দিন প্রতিপালন করেই যাচ্ছে। তার প্রতি অপত্য স্নেহে সে নিজে অসুস্থ হয়ে যায় কিন্তু ষাড়টি সম্পর্কে কেউ কুকথা বললেই সে রুদ্রচণ্ড হয়ে যায়। গফুরের পুত্রতুল্য এই ষাঁড়টির নামই হল মহেশ। গল্পের শুরুতে আমরা দেখি ঝাঁঝা রৌদ্রের তাপে বাবলা গাছের ডালে বেঁধে রাখা মহেশকে দেখে তর্করত্ন মশাই গফুরকে যাচ্ছেতা বলে অপমান করে শাসিয়ে বলেছেন গোহত্যা হলে কর্তা অর্থাৎ জমিদার শিবচরণবাবু তাকে নাকি জ্যান্ত কবর দেবেন। নিপীড়িতন, শোষিত, অপমানিত, লজ্জিত, অসহায় গফুর জোলা দিন প্রতিদিন দরিদ্রের ঢালে পড়ে মহেশের ঠিকমতো খেদমত করতে অক্ষম বলে তর্করত্নের কাছে বারবার কাকুতি মিনতি করেও এক কাহন খড় জোগাড় করতে পারে না। তর্করত্নের হাতের পুটুলিতে ফলমূল ভিজে চাল থাকা সত্ত্বেও গফুরের পুত্রবৎ মহেষের জন্য তার একমুঠো দিতে চাননি। গফুর হাত জোড় করে বিনতি করলেও প্রত্যুত্তর ছিল -

"যেমন চাষা তার তেমনি বলদ। খড় জোটে না, চাল-কলা খাওয়া চাই।"[২]

তর্করত্নের অপমানের জ্বালায় বিদগ্ধ হয়ে গফুর মহিষের পিঠে হাত বুলিয়ে চুপি চুপি বলতে লাগল -

"মহেশ, তুই আমার ছেলে, তুই আমাদের আট সন প্রতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস।" [৩]

এখানেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে গফুর মহেশকে কখনোই গৃহপালিত পশু বা ষাঁড় হিসেবে গণ্য করে না। সে মহেশকে পুত্রতুল্য স্নেহ করে লালন পালন করেই বড় করেছে। নিদারুণ দুঃখময় গরিবের

সংসারে মহেশের প্রতি গফুরের লুকানো ভালোবাসা ভিন্ন জায়গায় ফুটে উঠেছে যেমন - জীর্ণ ঘরের চাল থেকে মেয়ে আমিনাকে না দেখিয়ে খড় এনে মহেশকে দেওয়া, কিম্বা রোগাগ্রস্থ শরীরে খিদের জ্বালা থাকা সত্ত্বেও নিজে না খেয়ে সেই ভাতটুকু মহেশকে খাওয়ানো। তাছাড়াও মহেশ একবার প্রতিবেশী মানিক ঘোষের বাগানে ঢুকে সমস্ত গাছপালা নষ্ট করে দিয়েছিল বলে মানিক ঘোষ মহেশকে ধরিয়াপুরের খোয়াড়ে আটকে রাখে। গফুর যখন জানতে পারে দু-তিন দিনের মধ্যে মহেশকে সেখান থেকে না আনতে পারলে পুলিশের লোক মহেশকে গোহাটায় বিক্রি করে ফেলবে। এমনাবস্থায় রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে গফুর বংশী নামক এক দোকানদারের কাছে নিজের পিতলের থালাটি বন্ধক দিয়ে টাকা যোগাড় করে মহেশকে ছুটিয়ে আনে। এসব আসলেই পশু সুলভ প্রেমিক মনের একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ।

গল্পের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি শুরু হচ্ছে পাঁচ-সাত দিন ধরে পীড়িত, চিন্তিত গফুরের বিষাদানন দিয়ে। নিখোঁজ মহেশকে সর্বত্র খুঁজেও গফুর যখন তার সন্ধান পায়নি তখন মেয়ের মুখে শুনতে পায় মহেশকে নাকি প্রতিবেশী মানিক ঘোষ দরিয়াপুরের খোয়াড়ে প্রেরণ করেছে। স্তম্ভিত গফুর প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেনি যে প্রতিবেশী হয়ে গরিবের এমনটা অপকার কিভাবে করা যায়। কারণ তাদের অঞ্চলে মানিক ঘোষের গো-শব্দে ভক্তি ছিল প্রাবল্য। সে যাই হোক গফুর যখন জানতে পারে তিনদিনের মধ্যে মহেশকে ছুটিয়ে আনতে না পারলে পুলিশ তাকে গো-হাটায় বিক্রি করে ফেলবে। এমতাবস্থায় লেশমাত্র ইতস্ততবোধ না করে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে গফুরের খুড়ো বংশী নামক দোকানদারের কাছ থেকে খাবারের পিতলের থালাটি একটিমাত্র টাকার পরিবর্তে বন্ধক দিয়ে টাকার ব্যবস্থা করে। এতে শুধু মাত্র গফুরের আর্থিক অনটনের কথাই ফুটে ওঠেনি এরই সঙ্গে ফুটে উঠেছে তৎকালীন গ্রাম বাংলার পাড়া-প্রতিবেশীর, আশেপাশের লোকজনের সঙ্গে দুর্ব্যবহার। এটা হতে পারে কোন জাতি নির্ভর কিংবা আর্থিক বৈষম্যের তারতম্যগত কারণ। কারণ জাতিভেদ প্রথার একটি স্পষ্ট উদাহরণ রয়েছে গল্পে যেখানে আমরা দেখতে পাই আমিনা নামক গফুরের মেয়েটি ঘন্টার পর ঘন্টা দূরে দাঁড়িয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করলে যদি কেউ দয়া করে তার পাত্রে জল ঢালে তবেই সে ঘরে জল নিয়ে আসতে পারে। তবে প্রত্যেকদিন হয়তো দয়া করার মতো লোকজন কপালে জোটে না এক্ষেত্রে তৃষ্ণার্ত,পিপাসিত অবস্থায়ও সময় কাটাতে হয়। এর জন্যই হয়তো গল্পের শেষের দিকে অর্থাৎ মহেশের মৃত্যু পর্বে দেখা যায় বিক্ষিপ্ত ভাঙা ঘট থেকে জল ঝরে পড়ার পর মরুভূমির মতো শুষে মহেশ জল পান করছে। এই জল শুধুমাত্র জলই নয় এটি দীর্ঘদিনের অপেক্ষিত তৃষ্ণার্ত মনের পরিপূর্ণতা- এটাই মুক্তি।

এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও গফুর কখনই মহেশকে গোহাটায় নিয়ে বিক্রি করার কথা ভাবতেও পারে না। কারণ মহেশ শুধুমাত্র তার কাছে একটি প্রাণী নয়- এ যে তার ছেলে। একদিন একজন বুড়ো-গোছের মুসলমান ভদ্রলোক এসে মহেশকে অনেকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে গফুরের হাতে একটি দশ টাকার নোট বের করে দিয়ে মহেশকে কিনে নিতে চাইলেন। গফুর প্রথমে না বুঝতে পারলেও যখনই বুঝতে পারে যে টাকাটা আসলেই তার মহেশকে বিক্রি করার মূল্য তৎক্ষণাৎ টাকাটি ঢিল মেরে ছুড়ে দেয় তাদের প্রতি। শুধু তাই নয় রাগান্বিত অবস্থায় সেই ভদ্রলোকের প্রতি কিছু কটুক্তি ছিটিয়ে দেয়। যার ফলস্বরূপ শিবচরণ বাবুর সদরে ভদ্র-অভদ্র অনেকগুলি ব্যক্তির সঙ্গমে হওয়া বিচার সভায় তার কঠোর শাস্তিটি এমন -

"সে কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, এমন কাজ আর কখনো করবো না কর্তা! এই বলিয়া সে নিজের দুই হাত দিয়া নিজের দুই কান মলিল এবং প্রাঙ্গণের এক দিক হইতে আর এক দিক পর্যন্ত নাকখত দিয়া উঠিয়ে দাঁড়াইল।" [৪]

এভাবেই বারবার জমিদারের সভায় তাকে সর্বসম্মুখে মহেষের দুষ্কৃত কর্মের জন্য মুখ বুঝে শাস্তি পেতে হয়।

কিন্তু এ রকমই গঠনা আরও একবার যখন গঠিত হয় এবং জমিদারের পিয়াদারা গফুর কে নিতে আসে তখন সে তাদের প্রতি দুর্ভাগ্য উচ্চারণ করে বলে -

"মহারাণীর রাজত্বে কেউ কারো গোলাম নয়। খাজনা দিয়ে বাস করি, আমি যাবো না।"[৫]

প্রজার মুখের এত বড় স্পর্ধা প্রতাপশালী জমিদার শিবচরন বাবু কোনোমতেই সহ্য করতে পারেননি। সুতরাং দ্বিতীয় বারের মতো আবারও মহেশের দুষ্কৃত কর্মের ফলে গফুরকে প্রহার ও লাঞ্ছনা নিঃশব্দে মাথা পেতে গ্রহণ করতে হয়।

সহস্র যন্ত্রণাময় ও দুঃখময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়েও গফুর মহেশকে বিক্রি করেনি। মহেশ বাইরের লোকের ক্ষতি করলে তাও কখনো টাকা কিংবা প্রহার নিজর গায়ে নিয়ে যন্ত্রণা সহ্য করতে দেখি আমরা গফুরকে। কাজ করতে অক্ষম, বৃদ্ধ হয়ে যাওয়া মহেশের প্রতি গফুরের এক ফুটোও ভালোবাসা কমেনি। তবে গল্পের শেষ পরিস্থিতিটা সত্যিই নিদারুণ দুঃখময়ের। তৃষ্ণার্ত মহেশ আমিনাকে গুতো মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে বিক্ষিপ্ত ভাঙা ঘট থেকে জল খাওয়ার সময় আত্মসংবরণ করতে না পারা গফুর লাঙ্গল দিয়ে মহেশের মাথায় সজোরে আঘাত করাতে তৎক্ষণাৎ মহেশের মৃত্যু ঘটে। বুকভরা দুঃখ নিয়ে, গোহত্যার প্রায়শ্চিত্ত থেকে রক্ষা পেতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও
রাতের অন্ধকারে মেয়েকে নিয়ে ফুলবেড়ের চটকলের দিকে রওনা দেয় গফুর। মেয়ে আমিনা জল খাওয়ার ঘটি এবং ভাত খাওয়ার পিতলের থালাটি সঙ্গে নিতে চাইলে গফুর নিষেধ করে বলে -

"ওসব থাক্ মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।" [৬]

যে গফুর এতদিন ধরে নিজের প্রাণ প্রিয় পুত্রতুল্য মহেশকে দৈন্যের দায়ে বিক্রি করা তো দূরের কথা তার সমস্ত অপরাধের শাস্তি নিজ কাঁধে বহন করে এসেছিল গল্প শেষে তার হাতেই যে মহেশের মৃত্যু ঘটবে তা সত্যিই অমান্য। তবে এ মৃত্যু শুধু মহেশের নয়, এ যে সমাজের সমস্ত সমাজপতিদের যারা নির্মম,অমানবিক মূল্যবোধহীন। সেই জন্যেই গল্প শেষে নক্ষত্রখচিত কালো আকাশের পানে চেয়ে গফুর বলে ওঠে -

"যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস,তোমার দেওয়া তেস্টার জল তাকে খেতে দেয় নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাফ ক'রো না।"[৭]

শরৎচন্দ্র 'মহেশ' গল্পটির মধ্য দিয়ে একাধারে তৎকালীন গ্রাম বাংলার সমাজপতিদের ও ধনী জমিদার শ্রেণীর স্বৈরাচারী নির্যাতন ও শোষণের নিষ্ঠুরতা, স্তাবকদের চাটুকারিতা,নির্যাতিত মানুষের করুণ অসহায়তার কথার সঙ্গে পুরুষ মনের পাশবিক স্নেহের কথা জীবন্ত ভাষাচিত্রে অঙ্কন করেছেন মাত্র। সাংসারিক দীনতার মধ্য দিয়ে শতকষ্ট সহ্য করেও মহেশকে গো-হাটায় বিক্রি করেনি কিংবা কসাইয়ের হাতে পয়সার লোভে তুলে দেয়নি। কারণ আটসন অর্থাৎ আট বছর ধরে মহেশ নামক এই জন্তুটি গফুরের পরিবারের এক অনন্য সদস্য। যার বদলেতে গফুরের দৈনন্দিন শাকান্ন চলছে। মহেশের জন্য পাওয়া এ সমস্তই তার উপহার তার সম্বল। এখানেই বাৎসল্য প্রেমের স্ফুরণ এক বিশ্বজনীন রূপ লাভ করেছে।

পেশায় একজন পশু চিকিৎসক হলেও বাংলা সাহিত্যের 'অনুগল্প' নামের এক বিশিষ্ট ধারায় শ্রেষ্ঠ কথা সাহিত্যিক 'বনফুল' ছদ্মনামধারী বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর 'গণেশ জননী' গল্পটি পড়লে মনে হয় যেন তাঁরই জীবনের অন্তরঙ্গতায় লিখে রাখা কিছু বিশেষ মুহূর্তের একটি জীবন্ত দলিল। কারণ গল্পের শুরুতেই গল্পকার "আমি" বলে নিজেকে সম্বোধন করেছেন। মানুষ এবং জীবজন্তুর আন্তরিকতার একটি সুসম্পর্ককেই এ গল্পে পুঁথিগত রূপ দিয়েছেন লেখক।

'গণেশ জননী' গল্পের গণেশ কোন দেবতা বা মানুষের নাম নয় এটি একটি হাতি শাবক। গল্পে উল্লিখিত এক নিঃসন্তান ভদ্রলোক ও তার স্ত্রীর একজন কচ্চি ব্যবসায়ীর সেবা সুশ্রূষা করে তাকে সুস্থ করে তোলাতে তিনি উপহারস্বরূপ একটি ছোট্ট হাতির বাচ্চা তাদেরকে দিয়েছিলেন। গল্পকারের ভাষায় -

"হাতির বাচ্চাটি দেখতে চমৎকার - তখন ছোট্ট ছিল - দুষ্ট দুষ্ট চোখ, ছোট্ট শুড়, খুব ভালো লাগলো তখন। গিন্নি তো একেবারে আনন্দে আত্মহারা। বললে - ও আমার গণেশ এসেছে। বলেই তার সামনে এক বাটি দুধে গিয়ে দিলেন। বাস্,সেই থেকেই গণেশ থেকে গেল। আমাদের ছেলেপিলেও হয় নি, ওই গনেশই আমাদের সব।"[৮]

অর্থাৎ নিঃসন্তান দম্পতির জীবনে এই গণেশই তাদের বাৎসল্য স্নেহের একমাত্র উপভোক্তা। গণেশের দিন দিন বড় হওয়াতে ভদ্রলোক ঘরের দরজা গুলো কেটে বাড়িটাকে বিশাল আকারে পরিণত করে নিজেই সসঙ্কোচে একধারে বাস করছেন। হস্তি চিকিৎসক বনফুলের গণেশ পোষ মেনেছে কিনা এমন জিজ্ঞাসা করায় প্রত্যুত্তরে ভদ্রলোক বলেন -

"পোষ মেনেছে মানে! গিন্নি যখন নাইতে যায়, বালতি-গামছা শুড়ে করে নিয়ে দোলাতে দোলাতে গণেশ পিছু পিছু যায়। গরমের দিনে রান্নাঘরে বসে গিন্নি রাধে ও শুড়ে করে পাখা ধরে হাওয়া করে।" [৯]

গল্পটি পড়লে মনে হয় বস্তুত গৃহপালিত পশু-পাখি পরিবারেরই একজন সদস্য হয়ে উঠতে পারে। তবে পশু পাখিরা যে এমনভাবে রাগ,মান-অভিমান করে ছত্রিশ ঘন্টা ধরে অনাহারে বসে থাকতে পারবে এ কথাটি হয়ত গল্পটি না পড়লে বুঝে ওটা দূর্বুদ্ধ। কারণ প্রতিপালক জননী ও তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে বাগানের মালি ল্যাংড়া আম এনে দিয়েছিল। এর মধ্যে একটিও না রেখে গণেশের সমস্ত আম খেয়ে ফেলায়

ক্রোধবশত গিন্নি একটি চাপড় বসিয়ে বলেছিলেন -

"রাক্ষস, সব খেয়ে বসে আছ, একটি রাখতে পার নি আমাদের জন্যে।"[১০]

জননীর এমন ব্যবহারে গণেশের অভিমানের পালাটি এতটাই চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে অভাবী সংসারের অভাবকে দূরে ঠেলে দিয়ে সন্তানবৎ পোষ্য গনেশের চিকিৎসার জন্য প্রতিপালকের স্ত্রী নিজের স্বর্ণালংকার বন্ধক রাখতেও দ্বিধাবোধ করেননি। মা যেমন সন্তানের জন্য নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকেন, ঠিক তেমনি গণেশ জননীর সেই ভদ্রমহিলা গণেশের চিকিৎসার জন্য কোনোমতেই পিছপা হন নি। তবে গল্পকার অর্থাৎ চিকিৎসক বনফুল নিতান্তই মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন বলেই ট্রেনযোগে সাত-আট ঘন্টার পথ পাড়ি দিয়েও যেখানে কম করে হলেও তিনি দুশো টাকা ফি নিতে পারতেন সেখানে নিঃসন্তান জননীর তার গৃহপালিত পশুর উপর এমন ভালোবাসার আত্মিক সম্পর্ক দেখে আর একটি টাকাও নিতে পারেননি। এই টাকা না নেওয়ার পেছনেও পাঠকদের প্রতি হয়তো রয়েছে এক

বিরাট আহ্বান বাণী। অর্থাৎ দুরাচার,অনাচার ও নিতান্ত অর্থলোভী স্বৈরাচারী ভাবাবেগী না হয়ে পরের হিতে রতি হওয়ার বার্তাই হয়ত পাঠকদের প্রতি রয়ে গেল।

আসলে পৃথিবীতে ভিন্ন চোখের,ভিন্ন রূপের,ভিন্ন সাজের মানুষ রয়েছে। তারা হয়ত নিজেকেই ভালো করে বুঝে উঠতে পারে না। এতে করে জীবজন্তুর সঙ্গে আন্তরিকতা করে তাদের মান-অভিমান, দুঃখ,বেদনা বুঝে ওঠার মতো ক্ষমতা হয়তো সবার মধ্যে নেই। তবে বলা চলে জীবজগতের সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্কটি চিরকালীন। আলোচ্য 'গনেশ জননী' গল্পে গল্পকার তারই কিছু বিশেষ দৃষ্টিপাত চিত্রাঙ্কন করেছেন শব্দ ছন্দে। উক্ত গল্পে শুধু মানুষের পশুর প্রতি প্রেমই ফুটে ওঠেনি সঙ্গে ফুটে উঠেছে পশুরাও কিভাবে মানুষের প্রতি সমবেদনা অনুভব করতে পারে। জননীর সমস্ত প্রেম-ভালোবাসা,আদর ছিল গণেশকে ঘিরেই। গল্পে দ্রষ্টব্য যে জননী গনেশের জন্য কখনো বা আদর করে লেবু দিয়ে সুন্দর বার্লি বানিয়ে নিয়ে এসেছেন আবার কখনো স্যাকরার ধার সুদ করতে না পেরেও পুজোর সময় গণেশের জন্য রূপোর ঘন্টা বানিয়ে দিচ্ছেন। এমন অপাত্য স্নেহ দ্বিতীয় কোথাও আছে বলে মনে হয় না।

প্রতিপালক ভদ্রলোকের নিজস্ব বা পারিবারিক অবস্থা নিতান্তই দুর্বল ছিল। লেখকের কাছে হাতি চিকিৎসার জন্য যখন কল গিয়েছিল তখন তিনি ভেবেছিলেন হয়ত বা বিরাট বড় জমিদার হতে পারে। মফস্বলের ছোট্ট গ্রামে হাতি পোষা লোক মানে নিশ্চয়ই বিরাট প্রতিপত্তিশালী হবেন। তবে ট্রেন থেকে নেমে যে অবস্থা দেখলেন অর্থাৎ গোমস্তার মতো চেহারা ওয়ালা ভদ্রলোক যিনি ক্যাম্বিসের জুতো, গায়ে মলিন জামাকাপড় পরিধেয়, একমুখ খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা গোঁফ দাড়ি নিয়ে উনাকে আনতে গিয়েছিলেন। লেখক ভেবেছিলেন হয়ত বা মোটর জাতীয় কোন গাড়ি দিয়ে তাকে বাড়ি অবধি আনা হবে তবে স্বপ্নালোক থেকে বেরিয়ে দেখলেন সেই ভদ্রলোক সাইকেল চড়ে এবং তাকে একটি ছ্যাকড়া গাড়ি দিয়ে বাড়ির সম্মুখ অবধি আনার ব্যবস্থা করেছেন। তার ঘরের অবস্থাও তেমন ঠিকঠাক নয়। আসবাবের মধ্যে যেমন- একটি চৌকি, একটি দড়ির ছেঁড়া খাটিয়া, একটি নড়বড়ে টেবিল, গোটা দুই ক্যালেন্ডারের ছবি এবং সব থেকে বিস্ময়কর যে ব্যাপারটি ছিল সেটি হচ্ছে লেখককে একটি হাতল ভাঙ্গা কাপে চা খাওয়াচ্ছেন। এমন দুরূহ অবস্থাতেও যে কেউ হাতির মতো একটি বড় আকারের পশু এমন স্নেহের সঙ্গে প্রতিপালন করতে পারে তা সত্যিই অদৃষ্টপূর্ব।

সাম্প্রতিক অত্যাধুনিক যুগনির্ভর ডিজিটাল মানুষেরা আন্তর্জালিক ফাঁদে পড়ে এতটাই অমানবিক ও অমায়িক হয়ে উঠছে যে নিজের সংস্কৃতিকে ভুলে পাশ্চাত্যের অনুকরণ তাদের কাছে এক বিরাট পাওনা। এক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যম যদিও তাদের হাতের মুঠোয় তবে মানুষের সঙ্গে বহিরঙ্গের মেলবন্ধনটা অনেকটাই ফাঁকা পড়ে যাচ্ছে। তাই হয়তো আধুনিক জনবহুল মানুষ যারা জীবজন্তুকে ভালোবাসা তো দূরের কথা এদের মেরে অনেকটাই লুপ্তপ্রায় করে দিচ্ছে। এক্ষেত্রে মূল্যবোধস্খলন কোন বিরাট ব্যাপার নয়, কারণ বর্তমান সময়ের কিছু সংখ্যক মানুষের স্বভাবটাই এমন। দাম্পত্য জীবনে বাৎসল্য প্রেম যাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে অর্থাৎ যারা নিঃসন্তান তাদের ভালবাসার সমস্ত শতাংশই উপড়ে পড়বে কোনও এতিম শিশু বা অবলা গৃহপালিত পশু-পাখিদের ওপর এটাই স্বাভাবিক।

তাই শেষে বলা যায়,শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' হোক আর বনফুলের 'গণেশ জননী' দুই গল্পেরই প্রধান বিষয় কিন্তু একই অর্থাৎ মানুষ ও জীবজন্তুর আন্তরিকতা,তাদের আত্মিক সম্পর্ক। যে সম্পর্ক সমস্ত রকমের বাধা-

বিপত্তির উর্ধ্বে। যেখানে নারী ও পুরুষের একক বাৎসল্য প্রেম শুধুমাত্রই পাশবিক অর্থাৎ পোষ্য প্রাণীর প্রতি। 'মহেশ' গল্পে জমিদারী প্রথা,সামাজিক শোষণ, স্বৈরাচারী নির্যাতন, বর্ণ, ধর্ম, কর্ম প্রভৃতি বিষয়ের পাশাপাশি পাশবিক বাৎসল্য প্রেম এক নবমাত্রা পেয়েছে। অন্যদিকে 'গণেশ জননী' গল্পটির মূল ভিত্তিই হল মানুষ এবং জীবজগতের সম্প্রীতি এবং বাৎসল্যের ছবির চিত্রাঙ্কন। দুটি গল্পই পাঠক মনে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ জীব-জন্তুর প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে এক নতুন মানবিক মহিমা নির্মাণ করার ক্ষেত্রে সুবিবেচিত।

তথ্যসূত্র:

1) 'বাংলা সাহিত্য চয়নিকা', উচ্চতর মাধ্যমিক একাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক, রাষ্ট্রীয় পাঠ্যক্রম পরিকাঠামো ২০০৫ - এর আধারে, অসম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষে মনিমাণিক প্রকাশ পানবাজার,গুয়াহাটি- ৭৮১০০১ প্রথম প্রকাশ-মে ২০১০। পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৬৮-৬৯।
2) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭১।
3) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭১।
4) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭৬।
5) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭৮।
6) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮০।
7) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮০।
8) 'বনফুলের গল্প সমগ্র:প্রথম খন্ড', গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ - ১৩৫৮, প্রকাশক- নিরঞ্জন চক্রবর্তী। পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৫৬।
9) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৫৭।
10) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৫৭।

আকরগ্রন্থ:

1) চৌধুরী নারায়ণ, 'কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র' এ মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা- ১২।
2) চৌধুরী ভূদেব, 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার', মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলিকাতা- ৭০০০৭৩। প্রকাশক- শ্রী রবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য,বি.এ।